ইতিহাস ও সংস্কৃতি

একটি আন্তর্জাতিক, বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত, আন্তঃবিষয়ক,
বার্ষিক গবেষণাধর্মী সাময়িকী

চতুর্থ খণ্ড, প্রথম ভাগ

মুখ্য সম্পাদক
ময়ূখ দাস

সহযোগী সম্পাদক
অয়ন মুখোপাধ্যায়
মলয় দাস

কলকাতা :
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
২০১৮ খ্রি.

Scanned with OKEN Scanner

Itihas O Sanskriti

An International, Peer-reviewed, Interdisciplinary,
Annual Journal

Vol. IV, Part 1, July 2018 CE

ISSN 2394-5737 (Print)

Email: <achalikitihas@gmail.com>
Website: <www.anchalikitihas.com>

গ্রন্থস্বত্ব

© পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৮ খ্রি.

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্ব্যবহার, পুনর্নির্মাণ, পুনঃউৎপাদন করা যাবে না বা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষণ তথা হস্তান্তর করা যাবে না। প্রচ্ছদ বা সূচিপত্র ছাড়া এই জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা যাবে না। এই জার্নালে প্রকাশিত যাবতীয় প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, ব্যক্ত মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, ইঙ্গিত, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী অথবা সংস্থা কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক
মলয় দাস,
সভাপতি,
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

মুদ্রণ
এস. পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.,
৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য
৫০০.০০ টাকা

Scanned with OKEN Scanner

বৌদ্ধ দর্শনে নীতি

নমিতা সাহা
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, সংস্কৃত বিভাগ

সারসংক্ষেপ: বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে নির্বাণের পথ দেখানো, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্য এতই দুর্গম, এতই দুঃসাধ্য যে তারা কখনই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না তাই তাদের জন্য তিনি জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে অতি সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন- পরস্পরের প্রতি দয়ালু হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, প্রতিটি আশ্রমের যথোপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই উপদেশের মধ্যে অভিনব কিছু নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন যে সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর, সুস্থ জীবনের উপযোগী হয়ে উঠে।

সূচকশব্দ: বৌদ্ধ দর্শন, শীলভিত্তিক ধর্ম, আর্যসত্য, নৈতিকতা।

ধর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে অনেক সময়ই বলা হয় 'ধর্ম হল নৈতিক কর্মের অনুষ্ঠান মাত্র'।[১] ধর্মের এই স্বরূপটি বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধর্ম ও নৈতিকতার যোগসূত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই দর্শনে, যার অন্যতম অভিধাই হল 'শীলভিত্তিক ধর্ম'।

বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে ধর্মীয় জীবন সদ্‌গুণসম্পন্ন নৈতিক জীবন, যার দ্বারাই মুমুক্ষু তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। যদিও নির্বাণের স্তর উপলব্ধির স্তর, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ এই বৈপরীত্য থাকে না, কিন্তু যতক্ষণনা এই স্তরে উন্নীত হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারেন। *অঙ্গুত্তর-নিকায়* গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত, তিনি কখনই মুক্তিলাভের অধিকারী নন। সেই শ্রমণ-ই নির্বাণের অধিকারী যিনি পরম নৈতিক, যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজের বশীভূত, যিনি মিতাহারী এবং ধর্মপালনে নিযুক্ত। তাই বুদ্ধদেবের অনুশাসন হল,

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা ...
অধিচিত্তে চ অযোগো এতং বুদ্ধানুশাসনং।।[২]

অর্থাৎ সকল পাপকাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্তশুদ্ধি এ হল বুদ্ধদেবের অনুশাসন। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরম তপস্যা এবং নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। পরকে

আঘাত দিয়ে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না। অপরের নিন্দা না করা, অপরকে আঘাত না করা, নিয়ম সমূহ যথাযথ পালন করা, চিত্তকে সুদৃঢ় করা, মিতাহারী হওয়া, সবর্দা মনকে যোগযুক্ত রাখা- এই হল বুদ্ধদেবের উপদেশ।

বৌদ্ধ অনুশাসন বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এখানে শুধু জ্ঞান বা প্রজ্ঞার দ্বারা বা শুধু সমাধিস্থ হওয়া, যোগযুক্ত হওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রজ্ঞা, সমাধির সঙ্গে সঙ্গে শীল বা চরিত্র গঠনকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তিনটি পর্যায় হিসাবে কল্পিত। শীল বলতে বোঝায় চারিত্রিক শুদ্ধতা, সমাধি হল মনঃসংযোগ এবং প্রজ্ঞা হল তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ চারিত্রিক শুদ্ধতার মধ্যেই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা; সমাধি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে প্রজ্ঞা বা চরম তত্ত্বজ্ঞানে এই অগ্রগতির পরিসমাপ্তি। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা পরস্পর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত - এদের কোনোটিই অপরটির সাহায্য ছাড়া ক্রিয়াশীল হতে পারে না। শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা হিসাবে গৃহীত হওয়ায় বৌদ্ধমত 'শীল ভিত্তিক ধর্ম' বলে অভিহিত।

চারিত্রিক শুদ্ধতা মানে কিন্তু নিছক বাহ্য আচরণের শুদ্ধতা নয়। বাহ্য আচরনের ভালো-মন্দ, ইচ্ছার ভালো-মন্দের উপর নির্ভরশীল। তাই বৌদ্ধদর্শনে নৈতিকতা কেবলমাত্র বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রযুক্ত নয়, মনকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত করাও নৈতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্য। মনই সমস্ত চেতন কর্মের উৎস। আমরা প্রথমে ইচ্ছা করি তারপর কাজ করি। তাই ইচ্ছাশক্তি শুদ্ধ না হলে কর্মের শুদ্ধি সম্ভব হবে না। সেই জন্য বৌদ্ধ দর্শনে বাহ্য ক্রিয়া এবং মানসিক ইচ্ছাশক্তি উভয়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নৈতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক পটভূমিকা:

বৌদ্ধ নৈতিকতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় কোনো প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল সে-দিকে। প্রাক্-বুদ্ধ ভারতবর্ষে তিন ধরনের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল- একদল যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং মনে করতেন যে এই সমস্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি যে কোনো ধরণের কাম্য বস্তু লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় মতাবলম্বী দার্শনিকরা মনে করতেন ব্রহ্ম-ই একমাত্র সৎ বস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন যা কিছু তা সবই অসৎ, অনিত্য। তৃতীয় দলের অভিমত হল, জগতে কোনো স্বতন্ত্র নৈতিক নিয়ম মেই, কোনো কিছু সৎ, নিত্য বলে স্বীকার করা যায় না। যা কিছু বর্তমান তা স্বাভাবিক নিয়মবশেই বর্তমান, তার জন্য অন্য কোনো নৈতিক তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এই তিনটি ধারা পৃথকভাবে প্রচলিত থাকলেও প্রথম দুটির সূত্র বেদ, উপনিষদেই পাওয়া যায়। এবং এই বৈদিক ধারার পটভূমিকাতেই বৌদ্ধদর্শনকে বুঝতে হয়।

বেদের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী নৈতিক মতের সন্ধান পাওয়া যায়- কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ। জগতকে কাম্য ও ভোগ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ মনে করে কর্মমার্গের উপাসকরা জীবন সম্পর্কে এক আশাবাদী দৃষ্টি গ্রহণ করেন- জীবনে দুঃখের উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁদের চেষ্টা হতে থাকে কিভাবে কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের

Scanned with OKEN Scanner

আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করা যায়। কিন্তু এই পথের অসুবিধা হল এখানে বাহ্য আড়ম্বরের উপর জোর দেবার ফলে চিত্তের নৈতিক গুণগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে - যেমন শান্তি, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি। এককথায় বলা যায়, এই স্তরের নৈতিক দর্শন হল প্রবৃত্তির দর্শন।

উপনিষদের স্তরে কিন্তু প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অল্পকে পরিত্যাগ করে 'ভূমা'-র জন্য, পরম সত্যের অন্বেষণে সচেষ্ট হতে বলেছেন। মানুষ যে কেবল দেহ-মনের সম্মেলন মাত্র নয়, অতিরিক্ত কিছু, এই ধারণার উপর গুরুত্ব আরপ করে কেবল কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে - 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্'। মানুষের মূল লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে অমৃতত্বকে - যে অমৃতত্ব মানুষের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে পারে। কিভাবে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, কিভাবে সমস্ত দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় - এই চিন্তাই তখন মূল দার্শনিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এক কথায়, এই স্তরে আমরা পাই নিবৃত্তির দর্শন।

প্রবৃত্তির দর্শন ও নিবৃত্তির দর্শনের পার্থক্যের দরুনই অপবর্গ বা মুক্তিলাভের পথ হিসেবে কর্ম ও জ্ঞান এই দুটি ভিন্ন মার্গের নির্দেশ বৈদিক দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায়। এই দুটি বিপরীত ধারার সঙ্গে আরেকটি পথের স্বীকৃতিও দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় চিন্তাধারায়। সেই পথ হল ভক্তির পথ যেখানে কোনো একজন বিশেষ দেবতার প্রতি অনন্যা অবিচলা ভক্তি প্রদর্শনই মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করা হত। *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা*-য় এই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনটিকেই ব্যক্তির গুণগত তারতম্য অনুসারে মুক্তির জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম-তিনটির লক্ষ্য একই মুক্তি হলেও এদের মধ্যে জ্ঞানের পথকেই সাধারণভাবে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রাক্-বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সমাজে। অথচ এই জ্ঞানমার্গের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কেবলমাত্র বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি যাঁরা বুদ্ধির দিক দিয়ে বা চিন্তাধারা দিক দিয়ে সমাজে উচ্চতর আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলেন তাঁরাই এই মার্গের অধিকারী হিসেবে কথিত হতেন। সমাজের বাকি সাধারণ ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথ-ই ছিল একমাত্র অবলম্বনের বিষয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয় বর্ণবৈষম্য- এক শ্রেণি উচ্চ বর্ণের, অন্য শ্রেণিরা নীচ বর্ণের।

এই সামাজিক ও দার্শনিক পটভূমিকায় যখন বুদ্ধদেব তাঁর দর্শন রচনা করেন, তখন তিনি প্রথমেই এই বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটান। তিনি তাঁর ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেন সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষের দিকে, তাদের সবাইকেই তাঁর সংঘের অংশ করে তোলেন। মুক্তির পথ হিসেবে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ কর্মমার্গ অথবা দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন রূপ ভক্তিমার্গ পরিহার করে তিনি ধ্যান এবং চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বা সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায় এবং এই জ্ঞান উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য প্রশস্ত। মুক্তি কোনো বিশেষ শ্রেণির করায়ত্ত না করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়াই বৌদ্ধ ধর্মের অভিনবত্ব। ব্রাহ্মণদের সেবাই যারা নিজেদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ

করতেন, সেই শূদ্র শ্রেণির লোকের-ও যে ব্রাহ্মণদের মত মুক্তিতে সমান অধিকার আছে, এই মত প্রচার করে বুদ্ধদেব তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় এক ধরনের বিপ্লবের সূচনা করেন। এবং এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের দিগ্বিজয়ের মূলহেতু।

ব্রাহ্মণ্য নৈতিকতায় সঙ্গে বৌদ্ধ নৈতিকতার মৌলিক প্রভেদ এখানেই যে বৌদ্ধ নৈতিকতায় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে সার্বজনীন সত্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে যা একান্তভাবেই ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল। মুক্তির জন্য ব্যক্তির নিজের উপর গুরুত্ব স্থাপন তৎকালীন সমাজের পটভূমিকায় অসাধারন-ই বলতে হবে। মানুষকে দৈব শক্তির উপর বা বাহ্য কোনো শক্তির উপর নির্ভর না করে, প্রত্যেকে মানুষকে নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলিষ্ঠ পৌরুষ বা আত্মপ্রভাব-ই নির্বাণ পথযাত্রীর একমাত্র পাথেয় দেবপ্রসাদ বা দৈবীকৃপা নয়। মনস্বী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বৌদ্ধধর্ম* গ্রন্থে বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্মগুণে, নিজ পূন্যবলে আত্মপ্রভাবে, সত্যোপার্জনে, প্রেম, দয়া, মৈত্রীবন্ধনে ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গল নিদান নির্বাণরূপে মুক্তিলাভের অধিকারী। যে পথে চলতে হবে, তা বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক ধর্মপথ। গম্যস্থান নির্বাণমুক্তি সারথি আত্মশক্তি।

বৌদ্ধ দর্শনে দুই স্তরের নৈতিকতা:

যদিও বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে নির্বাণের পথ দেখান, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্য এতই দুর্গম, এতই দুঃসাধ্য যে তারা কখনই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না তাই তাদের জন্যই তিনি জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে অতি সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন- পরস্পরের প্রতি দয়ালু হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, প্রতিটি আশ্রমের যথোপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই উপদেশের মধ্যে অভিনব কিছু নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন যে সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর, সুস্থ জীবনের উপযোগী হয়ে উঠে। তাই সাধারণ মানুষের জন্য তিনি এইসব সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন, আর তাঁর দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব বিশেষ কিছু শিষ্যের কাছে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে সমস্ত নৈতিক কর্তব্য পালন যেন আসল 'মার্গের-ই' প্রবেশদ্বার। কেউ কখনও আশা করতে পারেন না যে তিনি এই সাধারণ কর্তব্য পালন না করেই উচ্চ মার্গে প্রবেশের অধিকারী হয়ে উঠবেন। এই সৎ কর্ম সম্পাদনের উপর জোর, তৎকালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদের পটভূমিকায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদে সাধারণ ধর্মের কথা স্বীকার করা হলেও মনে করা হত যে ব্যাক্তির সুখ সমৃদ্ধি এই সাধারণ ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়- তার জন্য প্রয়োজন যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান। বুদ্ধদেব যাগাদি অনুষ্ঠানকে দূরে সরিয়ে রেখে চরিত্র গঠন করাকে সুখ সমৃদ্ধি লাভের পথ হিসেবে গণ্য করেছেন। সুখ, সমৃদ্ধি লাভের উপায় হলেও চরম লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্তব্য পালন সোপান স্বরূপ, তদতিরিক্ত নয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই মানসিক এমন এক স্তরে উপনীত হন, যেখানে সহজেই চিত্তকে সংযত করা যায় বা আবেগ দমন করা যায়।

Scanned with OKEN Scanner

এই ধরনের মানসিক অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতায় প্রবেশ সহজসাধ্য হয়।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বৌদ্ধদর্শনে দুই স্তরের নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে- নিম্ন স্তর এবং উচ্চ স্তর। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন নৈতিক কর্তব্য পালন যা নিছক-ই প্রস্তুতিমূলক, যার মধ্যে বৌদ্ধ উপাদান আলাদা করে পাওয়া সম্ভব নয় এবং উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা, যার লক্ষ্য হল নির্বাণ প্রাপ্তি এবং যা একান্ত ভাবেই বৌদ্ধদর্শনের। এই পর্যায়ের নৈতিকতার লক্ষ্য নিছক ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করা নয়, এখানে লক্ষ্য হল আরো গভীর- কি ভাবে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

এই উদ্দেশ্য তিনি মানুষকে দুঃখ, তার উৎপত্তি, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এই চারটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে মত তাই হল তাঁর এই স্তরের নৈতিকতার মূলতত্ত্ব। এইগুলিকে বলা হয় আর্যসত্য। সুতরাং চারটি আর্যসত্য হল- দুঃখ, দুঃখসমুদায়, নিরোধ ও মার্গ।

কাজের ভালো-মন্দ বিচার:

বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো ক্রিয়া ফল-নিরপেক্ষভাবে স্বতই ভালো বা মন্দ, কুশল বা অকুশল বলা যায় না। নৈতিকতা সর্বদাই একটা লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়-নিম্নস্তরের কর্ম ইহজীবনে বা পরজীবনে সুখপ্রাপ্তির উপায়; উচ্চপর্যায়ের ক্রিয়া পূনর্জন্ম বা জন্মমৃত্যুচক্রের হাত থেকে পূর্ণ নিবৃত্তির উপায়। এক কথায় বলা যায় সৎ বা ভালো তাকেই বলা হবে যা ব্যক্তিকে সুখের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর মন্দ তাই যা দুঃখের আবহ।

মন্দ কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে *ধম্মপদ* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি।
যস্স অস্সমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।।

ভালো কাজের পরিচয় –

তং চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি।
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।।[৩]

তবে, এর থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বৌদ্ধ দার্শনিকরা ফল দেখে কাজের নৈতিকতা বিচার করে থাকেন তাহলে ভুল হবে। তাঁরা কখনই কাজকে যান্ত্রিক ক্রিয়া হিসেবে দেখেন না। তাদের মতে কাজ সর্বদাই মানসিক- আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন ঘটে আমাদের ক্রিয়ায়। তাই ইচ্ছাশক্তির শুদ্ধতাই গুরুত্বপূর্ণ। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ফল শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন, তা পূণ্য বা পাপের সঞ্চার করতে পারে না। অন্য দিকে সম্পূর্ণ শুভ অভিপ্রায় নিয়ে যে কাজ করা হয় তার ফল আপাতদৃষ্টিতে মন্দ হলেও তা পূণ্যের কাজ বা ভালো কাজ বলে বিবেচিত হবে। বাবা-মা যখন সন্তানের ভাবী মঙ্গলের কথা ভেবে সন্তানকে তার অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি দেন, তখন বাবা-মা'র সেই কাজ কখনও মন্দ বলে গণ্য হয় না। অনুরূপভাবে তথাগত নিজেই এমন কাজের অনুষ্ঠান করতে পারেন যা আপাত হিংসাত্মক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাঁর অভিপ্রায় সর্বদাই সৎ তাই তার সেই কাজ কখনই পাপজনক বলে গৃহীত হবে না।

Scanned with OKEN Scanner

জৈনমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের তফাত এখানেই যে জৈনমতে যে কোনো কর্মই জীবকে বদ্ধ করে, কিন্তু বৌদ্ধ মতে সৎ অভিপ্রায় দ্বারা চালিত কাজ জীবের বন্ধনের হেতু হয় না। তাই কাজের ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠির (Standard) প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে বলতে হয় বৌদ্ধগণ উপযোগিতাবাদে (Utilitarianism) বিশ্বাসী নন; তাঁদের মত অনেকটাই সজ্ঞাবাদ (Intuitionism) এর অনুরূপ।

অপর ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির আচরণের প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিক আরেকটি ব্যাবহারিক মাপকাঠির কথা বলে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য হল যে, অপর ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির সেই আচরণই করণীয় যা ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে করা যায় বলে মনে করেন। অর্থাৎ এখানে অপর ব্যাক্তিকে নিজের সদৃশ ভেবে কাজ করা উচিত –'অত্তানম্ উপমং কত্বা'। এইভাবে যদি কাজ করা হয় তাহলে স্বার্থপর অভিসন্ধি বর্জন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি যেহেতু নিজের সদৃশ ভেবে অপরের সঙ্গে আচরণ করছেন, তাই কখনই তিনি এমন কোনো কাজ করতে পারেন না যা অন্যকে আঘাত দেবে বা কষ্ট দেবে। কারণ অন্যকে আঘাত করতে গেলেই ব্যাক্তির মধ্যে এই চিন্তা আসবে যে ঐ ব্যক্তির স্থানে সে নিজে থাকলে ঐ আঘাত তার কেমন লাগত। এইভাবে যদি কেউ কাজ করেন তাহলে তার পক্ষে কখনও কোনো অন্যায় বা পাপ আচরণ করা সম্ভব নয়।

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, বৌদ্ধ মতে নৈতিক আর্দশ হল পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমস্ত নৈতিক অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করা। প্রকৃত নৈতিক হয়ে ওঠার জন্য শীল সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত পূরণ করা দরকার যার জন্য সন্ন্যাসীর জীবন বা বৌদ্ধ পরিভাষায় 'অনাগার' জীবন একান্তভাবে প্রয়োজন। বুদ্ধদেব নিজে শ্রমণকে যথার্থ নৈতিকতার উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তিনি সংসারের জীবনকে, 'সাগার' জীবনকে মুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে মনে করেন নি। বৌদ্ধ সংঘ চার ধরণের লোক নিয়ে গঠিত হত – ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, গৃহী ও নারী। এই চার ধরনের ব্যাক্তির সুশৃঙ্খলিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে সংঘের শরীর গঠিত হয়েছে বলে মনে হয়, অর্থাৎ সংঘ গঠনের ব্যাপারে এই চার ধরনের ব্যক্তির মধ্যে কোনো ভেদ করা হত না। এমনকি কোনোকোনো উপদেশে বুদ্ধদেব একথাও বলেছেন যে শুদ্ধতা উপলব্ধির পর প্রাকৃতজন ও ভিক্ষুর মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। নৈতিক ব্যাক্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে *ব্রহ্মাজালসূত্র*-এর ভাষ্যকার বলেছেন – তার মাতা হল প্রজ্ঞা, তার পিতা হল উপায়, আত্মীয় হল সমস্ত জীব, বাসস্থান হল শূণ্যতা, স্ত্রী হল প্রীতি, কন্যা মৈত্রী, পুত্র সত্য; স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-পরিজন থাকা সত্ত্বেও তার পারিবারিক জীবন তাকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে না। এইভাবে সংসারে থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত, উদাসীন রাখার আর্দশ পালন করার কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই উপায়েই প্রাকৃতজনের নৈতিকতা ও আর্দশ নৈতিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

Scanned with OKEN Scanner

সূত্রনির্দেশ

১. Francis Herbert Bradley; 'Religion is essentially a doing and doing what is moral'; *Ethical Studies*; Oxford: OUP; 1988; pp. 314.
২. *ধম্মপদ*, ১৪; ১৮৩-৮৫ শ্লোক।
৩. *তদেব।*

নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্সে বজ্জদস্সিনং।
নিগ্গয়্হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পন্ডিতং ভজে।
তাদিসং ভজমানস্স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো।। (৬.১)

সহায়ক গ্রন্থ

১. ড. সুমিতা বসু; *ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা;* কলকাতা: সদেশ প্রকাশক; ২০১১।
২. ড. বিপদ্‌ভঞ্জন পাল; *ভারতীয় দর্শন;* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার; ২০০৪।
৩. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও ড. পীযূষকান্তি ঘোষ; *ভারতীয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞান;* কলকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স; ২০০৪ (পুনর্মুদ্রণ)।
৪. রমেশচন্দ্র মুন্সী; *ভারতীয় দর্শন;* কলকাতা: বৈকুণ্ঠ বুক হাউস; ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ)।
৫. প্রদ্যোত কুমার মন্ডল; *ভারতীয় দর্শন;* কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স; ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)।
৬. অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য; *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা;* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো; ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

Scanned with OKEN Scanner